সুলেখা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥সুলেখা॥

অজ-পাড়াগাঁয়ের পথে যখন গাড়ী ঢুকলো তখন সুলেখার কান্না এল। এই সে কলকাতায় ইস্কুলে-কলেজে পড়েছিল? এই পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী হবে, যত অশিক্ষিতাদের মাঝখানে দিন কাটাতে হবে। কলকাতায় নীলিমাদের বাড়ী গিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় চায়ের আড্ডা, সেখানে জগদীশ বড়ুয়া ও হিরণ্ময় মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা, ভয়েল কাপড়ের জরির ধারে কি রঙের পাড় সেলাই হবে এ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা, গৌরীদের বাড়ী গিয়ে রেডিওতে নতুন নতুন গান শোনা—সব শেষ হয়ে গেল। গানের সে ভীষণ ভক্ত। ভালো গান শুনতে পেলে আর কিছু সে চায় না।

এ-সবের পরিণতি?

এই জন্যে কাকা তাকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন? না দিলেও পারতেন। আরও অল্প-বয়সে বিয়ে দিলেও চলতো। তার চোখ ফোটবার আগেই। কথাটা সে কাউকে বলতেও পারলে না, বলতে পারলে বোঝা নেমে যেতো অনেক।

স্বামীকে তার পছন্দ হয়েছিল।

BANGLADARSHAN.COM

স্বামী শ্যামবর্ণ, অল্প বয়েস। বি-এ পাশও করেচেন। কিন্তু হোলে কি হবে, তিনি বিদেশে চাকরি করেন, গল্প-গুজব করবার জন্যে তাঁকে পাওয়া যাবে না সব-সময়। অশিক্ষিতাদের মধ্যে অজ-পাড়াগাঁয়ের একা-একাই দিন কাটাতে হবে। মরে যাবে সে। নীলিমা কতদূরে পড়ে রইল, ও এবার আই-এ পাশ করবে—সামনে কত আনন্দভরা মুক্ত জীবন!

সে আটকে গেল, ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল-ঝাঁঝির দামে। জীবনের গতি ওর বন্ধ হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়েচে...

একটি জীর্ণ একতলা বাড়ীর সামনে ওদের গাড়ী এসে পৌঁছলো। কতকগুলো প্রাচীনা, কতকগুলো পাড়াগেঁয়ে-বৌ, তাদের মুখে চোখে না আছে বুদ্ধির দীপ্তি, না আছে কিছু, তারাই এসে সুলেখার চারিধারে ভিড় জমালে। কলকাতার বাসাতেই বৌভাত হয়ে গিয়েছিল। কোনো আচার-অনুষ্ঠান বাকি ছিল না, থাকলে আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠতো ব্যাপারটা।

স্বামীর ছুটি নেই। তিনি তাকে পৈতৃক বাড়ীতে প্রাচীনাদের হাতে পৌঁছে দিয়েই সরে পড়লেন। মিলিটারি চাকরি, বিশেষ ছুটিছাটা নেই। যদি সময় পান, পূজোর সময় আসবেন বলে গেলেন।

সমীর চলে গেলে সুলেখা কান্নায় ভেঙে গেল। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল সে। কিভাবে দিন কাটবে এখানে বুড়ীদের মধ্যে? যারা বাইরের জগতের কোনো সংবাদ রাখে না এমন তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা দন্তহীন বুড়ীদের মধ্যে।

টাকা ছিল না কাকার। নতুবা শহরে বিবাহ হোতো।

যাক সে কথা। ছেলে দেখে বিয়ে দেওয়া। ছেলে সত্যিই ভালো। স্বামীকে সে গর পছন্দ করে নি। ভালো ছেলে, পাশকরা, স্বাস্থ্যবান। গ্রামের বাড়ী জীর্ণ বটে, কিন্তু বেশ বড়। অনেক নাকি জায়গা-জমি আছে, প্রজাপত্তর আছে, আম-বাগান, পুকুর, বাঁশঝাড় আছে। বনেদি সেকেলে গৃহস্থ।

তবে ওই যা কথা, সেকেলে—একেবারে সেকেলে।

শাশুড়ী সুলেখাকে দিয়েচেন একছড়া ভারি সেকেলে মুড়কি-মালা হার। দিয়ে বলেছিলেন—বৌমা, বড় পয়মন্ত জিনিসটা। আমার শাশুড়ী আমাকে এই হার দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, আমি তোমাকে দিলাম আবার। তুমি আবার দিও তোমার ছেলের বৌকে—জন্মো-এইস্ত্রী হও, আমার মাথায় যত চুল আছে ততদিন সমীর বেঁচে থাকুক।

সুলেখা শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। হাড়ছড়াটি ভারি বটে, কিন্তু একালে ও-হার কেউ পরে! গৌরী কি ভাববে, কলেজের অনুদি কি ভাববে, যদি ও আজ মুড়কি-মালা হার গলায় দিয়ে কলকাতায় গিয়ে হাজির হয়?

BANGLADARSHAN.COM

দিন পাঁচ-ছয় কেটে গেল।

সুলেখাকে ভোরে উঠে কাজকর্ম্মে বড়-জা নীরদাকে সাহায্য করতে হয়। অবিশ্যি নতুন বউ বলে এখনো কাজের ভার তেমন ঘাড়ে চাপে নি, কিন্তু নীরদাকে দিয়ে সে বুঝতে পারে এ সংসারে পুরনো বউ হয়ে গেলে কি ধরনের খাটুনিটা আশা করা যায়।

নীরদা উদয়াস্ত খাটে, টিন-টিন ধান সেদ্ধ করে, বোঝা-বোঝা ক্ষার কাচে, খই মুড়ি ভাজে, দু-বেলা রান্না করতে আসে, এখন ওরা একবেলার ভার সুলেখার উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টায় আছে বোধ হয়। নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় বলচে না।

সুলেখা রাঁধতে জানে না যে তা নয়—কিন্তু গেঁয়ো রান্না চচ্চড়ি, সুক্তুনি, মোচার ঘণ্ট, ঝালের ঝোল, বড়ির টক—এসব সে রাঁধতে জানে না। তাছাড়া ভালোও লাগে না এসব তার। এ-ভাবে জীবন নষ্ট করার কি মানে হয়?

সুলেখা সুন্দরী মেয়ে, কলেজের থিয়েটারে গতবার মালিনীর পার্ট নিয়েছিল। সুশ্রী চেহারার জন্যে আর চমৎকার গানের গলার জন্যে যা মানিয়েছিল ওকে! গৌরীর মা টিসু শাড়ি পরিয়ে, সোনার গহনা দিয়ে, কপালে

অলকাতিলকা এঁকে ওকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন—ইংরেজী অধ্যাপিকা তরুণী উষাদি গ্রিন্-রুমে এসে ওকে কিভাবে অভিনন্দিত করলেন—এসব কথা তো আর বছর রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের দিনের!

আজ মনে হচ্ছে কত কাল...

সে-সব দিন শেষ হয়ে গেল।

এর চেয়ে তার না-ই বা বিয়ে হোতো। থাকতো সে ঊষাদির মত, নলিনীদির মত, মিস সেনের মত, মিস সাধুবালা গাঙ্গুলির মত অবিবাহিতা।

হাতে ভ্যানিটি-ব্যাগ ঝুলিয়ে, খাটো ছাতা-হাতে ট্রাম ধরতে ছুটতো বেলা সাড়ে দশটায়। যেখানে খুশি তুমি যাও, সিনেমা দ্যাখো, নাচগানের জলসা ফার্স্ট ক্লাসে নিউ এম্পায়ারে—কি মজা!

সকালবেলা। ওর বড়-জা এসে বললে—রাঙা-বৌ, এক কাজ করতে হবে যে!

সুলেখা বললে—কি দিদি?

—কলাই ডাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এগুলো ছাদে নিয়ে গিয়ে রোদে দাও, তারপর বেলা পড়লে ঝেড়ে তুলতে হবে। বুঝলে?

—বেশ।

BANGLADARSHAN.COM

—পারবে তো?

—করি নি কখনো, তবে চেষ্টা করি।

সুলেখা ডাল ছাদে দিয়ে এসেছে, তারপর আর ডালের কথা ওর মনে নেই। দুপুরে আহারের পরে একটু শোবামাত্র ওর ঘুম এসেচে। বেলা দুটোর সময় কালো ভোমরার মত মেঘ করে নেমেচে ঝম্‌ঝম্ জল। ও অঘোরে ঘুমুচ্চে তখন। ঘুম যখন ভেঙেচে তখনও সমানে বৃষ্টি হচ্চে। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি খানা-ডোবা ভর্ত্তি করে ফেলেচে দু ঘণ্টার মধ্যে। সুলেখা উঠে চোখ মুছতে মুছতে জানালা দিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। বৃষ্টির এমন রূপ সে শহরে দেখে নি কখনো। বকুল গাছের গুঁড়িটা কালো দেখাচ্ছে বৃষ্টির ধারায়। ছাতারে পাখীগুলো অঘোরে ভিজচে—ও যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটার কথা মনে এনে দেয়—

এদের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই সময় খেতে হয় গরম চা। সে নতুন বৌ, চা তৈরি করতে যেতে পারে না। কিন্তু কারো কি সেদিকে দৃষ্টি আছে, না কেউ কিছু বোঝে?...ও-কে মাগো, ওদের বাড়ীর বুড়ীটা কি করে ভিজচে এই জলে নারকোলপাতা কুড়ুতে। পাড়া-গেঁয়েদের কাণ্ডই আলাদা!

এমন সময় ওর জা ঘরে ঢুকে বললে—রাঙা-বৌ, ডালগুলো তুলেছিলে ছাদ থেকে?

সর্ব্বনাশ! সেকথা একদম মনে নেই সুলেখার। লজ্জায় তার সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠলো, অপ্রতিভ সুরে বললে—ওই যাঃ! সেকথা মনেই নেই দিদি—এক্ষুনি আমি যাচ্ছি ছাদে—

লজ্জায় সুলেখার মনে হচ্ছিলো যে মাথা কুটে মরে।

এই সব অশিক্ষিতার দল তাকে কি রকম আনাড়িই না মনে করচে। তাকে 'স্মাট' বলে সবাই জানতো কলেজে। সুলেখা ধড়মড় করে উঠে ছুট দিল ছাদের দিকে, ওর জা সস্নেহে ওর দিকে চেয়ে বললেন—ছুটতে হবে না রাঙা-বৌ, বোসো—বোসো।

—বসবো কি দিদি, ডাল যে ভিজে নষ্ট হয়ে গেল।

—সে কি এখনো ছাদে আছে ভাই! তুমি ঘুমুচ্ছিলে যখন বিষ্টি এল, সে আমি তুলে আনলুম যে!

কৃতজ্ঞতায় সুলেখার সুন্দর চোখের দৃষ্টি বিনত হয়ে এল। সত্যি ভালো লোক বটে, তার জা। মজা দেখবার মত লোক নয়। ও বললে—বাঁচলুম দিদি। ধন্যবাদ। তুমি আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালে।

সুলেখার জা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে বললে—রাঙা-বৌয়ের থিয়েটারি ধরনের কথা শুনে হেসে মরি। ও-মাগো...

BANGLADARSHAN.COM

এ একটা মস্ত বড় পরাজয়ের দিন বলে সুলেখা মেনে নিলে।

ডাল কখনো তোলে নি সে, অতশত তার মনে থাকে না পাড়াগাঁয়ের লোকের মত।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ও-পাড়ার কামিনী এসে বললে—কি হচ্ছে গো বৌদিদি?

—চুল বাঁধচি, এসো ঠাকুরঝি। চুলের দড়িটা ধরো তো!

—গান করবে?

—সন্ধে-বেলা গান করলে শাশুড়ী আমায় ভালো চোখে দেখবেন? একেই তো আনাড়ি হয়ে আছি এ বাড়ীর মধ্যে। সে হবে না ভাই। তবুও তুমি আজ প্রথম বলে গানের কথা।

—কেউ বলে নি বুঝি তোমায় বৌদিদি?

—কে আর বলচে!

এই সময় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো ঘন হয়ে—কামিনী চলে যাবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বললে—চলি আজ বৌদিদি, আর একদিন আসবো।

এক-পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে সেদিন বিকেলে। সুলেখার ঘরের জানালার ঠিক বাইরে নেবুগাছে লেবু ফুল ফুটেছে–বৃষ্টিজল অপরাহ্নের বাতাসে ভুরভুরে নেবুফুলের গন্ধ...

বড় জা নীরদা ওর ঘরে ঢুকে বললে–কি হচ্ছে রাঙা-বৌ?

–আসুন দিদি। কি আর হবে, এমনি বসে আছি।

–রান্নাঘরে চলো। দুটো ডাল ভাজবো, তুমি বসে বসে কুলোয় ঝাড়বে।

–আচ্ছা দিদি, সবসময় এসব কাজ তোমাদের ভালো লাগে? একটু অন্য রকমের কাজ–একটু ভালো কাজ...

নীরদা হেসে বললে–সময় নেই ভাই। দেখচো তো সংসারের কাজ নিয়ে বেহাতি।

–ওরই মধ্যে সময় করে নিতে হয়–

বিরক্তিতে সুলেখার মন ভরে উঠলো। এমন সব অশিক্ষিতাদের মধ্যেও সে এসে পড়েচে। এরা শুধু জানে ডাল ভাজতে আর ভাত রাঁধতে। শুধু খাওয়া আর খাওয়া।

নীরদা বললে–তুমি তো রাঙা-বৌ নতুন এসেচো। এখন প্রথম প্রথম তোমার খারাপ লাগবে–এর পর এই আবার লাগবে ভালো। তখন অন্য কিছুতে মন যাবে না।

BANGLADARSHAN.COM

সুলেখা মনে মনে বললে–সে দিন আমার জীবনে হঠাৎ না আসুক।

চক্ষুলজ্জার খাতিরেও ওকে গিয়ে ডাল ভাজতে বসতে হোলো রান্নাঘরে। দুটি ঘণ্টা সে কি খাটুনি। নীরদা ডাল ভেজে দিচ্চে আর ও আনাড়ি-হাতে কুলোতে ঝাড়চে। অনেক রাত্রে ঘুম-চোখে সুলেখা এসে যখন বিছানায় শুয়ে পড়লো, তখন তার মন অবসাদে ও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েচে। কি কর্ম্মফলে এমন সংসারে সে এল!

অনেক রাত্রে সেদিন ঘুম ভেঙে উঠে সুলেখা শুনলে কে গান গাইচে...

সুলেখা উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করলে–গুন্-গুন্ করে কে গান ভাঁজচে–নিপুণ কণ্ঠের আলাপ। ও ভাবলে–বা রে, এমন জয়জয়ন্তী আলাপ করে কে?

সুলেখা নিজে গায়িকা। সে বুঝলে, যে এই গুন্-গুন্-সুরে আলাপ করচে, সে নিপুণা গায়িকা। সুলেখা অমন আলাপ করতে পারলে নিজেকে ওস্তাদ মনে করতো। কিন্তু এ কি সম্ভব?

এখানে কে গা গাইবে এমন?

সুলেখা আরও শোনবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়ালো, সেই সময় গানও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যে গাইছিল, সে অন্যমনস্কভাবেই একটুকরো গান অল্প একটু সময়ের জন্যে গাইছিল–ঠিক গান গাইবার জন্যে নয়।

সুলেখা ঘুম ও বিস্ময়জড়িত চোখে এসে শুয়ে পড়লো। সকালে উঠে এ ঘটনার কথা ওর মনে ছিল না, কিন্তু একটু বেলা বাড়লেই মনে এলো রাত্রের সেই অস্পষ্ট জয়জয়ন্তীর সুর। তখুনি সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে সমস্ত ঘটনাটা। স্বপ্নের ব্যাপার হয়তো সমস্তটা...

গ্রামের ও-পাড়ায় সুলেখা কখনো যায় নি। এবার একদিন ও-পাড়া থেকে কয়েকটি মেয়ে ওকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। তারা সকলেই একবাক্যে সুলেখার রূপের প্রশংসা করলে, চা খেতে বসে রান্না রান্নার গল্প করেন। এরা চোখ থাকতে অন্ধ নাকি? এমন যে সুন্দর লাইলাক রঙের জরিপাড় শাড়ী পরে আছে সুলেখা, তার দিকে কারও চোখ গেল না? কেউ বললে না সে-কথা। না বললে বিখ্যাত ছবি 'মায়ামুকুর' সম্বন্ধে পুড়িয়ে-খেতে একটা বাক্যি। সুলেখা ওদের কাছে 'মায়ামুকুর'-এর গল্পটা করেচে, ওর সব গানগুলিই সে গাইতে পারে একথাও জানিয়ে দিয়েচে, অথচ গান গাইতে বললেও না তাকে কেউ। হিরণ্ময় মিত্রের গান সবগুলো—কে জানে না হিরণ্ময় মিত্রকে, তাঁর সুকণ্ঠকে?

সুলেখার ইচ্ছে হোল, এই মূঢ় অশিক্ষিতা সামনে একবার হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে 'চাঁদের দেশের রাজকুমারী'র কিংবা ফাল্গুন এলে এসো এসো'র অপূর্ব্ব সুরপুঞ্জে ঘর ভরিয়ে দেয়।

কারণ যে-বাড়ীতে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, একটা ভাঙা হারমোনিয়াম ছিল সে-বাড়ীতে। একটি এগারো-বারো বছরের ছোট মেয়ে বেসুরে একটা সেকেলে শ্যামাসঙ্গীতও গেয়েছিল—বোধহয় তাকেই বিশেষ করে শোনাবার জন্যেই। এ-গ্রামে কেউ বোধহয় খবর রাখে না যে সে একজন গায়িকা।

BANGLADARSHAN.COM

বাড়ী ফিরে দেখলে, ওর জা তালের বড়া ভাজবে বলে তালের রস বার করচে। ও কে দেখে বললে—রাঙা-বৌকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে তোমরা?

মেয়ের দল বললে—তুমি তো আর যাবে না বড়বৌদি, তুমি গেলে অবিশ্যি আজ খুব ভালো হোতো। আমাদের সে ভাগ্যি কি আর আছে।

নীরদা বললে—বোস সবাই। তালের ফুলুরি খাবি। রাঙা-বৌ, তুমি তালের গোলাটা করো, আমি কড়ায় তেল চড়িয়ে দিই।

একটি ধামা বড়া ভেজে যখন ওরা উঠলো তখন রাত ন'টা। মেয়ের দল ইতিমধ্যে দু-দশটা বড়া খেয়ে চলে গিয়েচে। সুলেখার এসব কাজে অভ্যাস নেই। ঠায় বসে থাকা রান্নাঘরের গরমে কতক্ষণ পোষায়? এরা শুধু জানে, ভোজনের তরিবৎ করতে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত।

মনে পড়লো, ওদের কলেজের এক অধ্যাপক বলেছিলেন, বাঙালীর ঘরে রান্নার বন্দোবস্ত যে ধরনের, তাতে খাটুনি এবং আয়োজন যত বেশি, খাদ্যবস্তুর পুষ্টিকারক গুণ তত নেই। জিবে ভালো লাগানোর দিকে যত লক্ষ্য, খাদ্যের গুণাগুণের দিকে তত লক্ষ্য থাকলে আজ বাঙালীর স্বাস্থ্য এত খারাপ হোতো কি?

বসে বসে শুধু নির্ব্বোধের মত একরাশ তালের বড়া ভাজা...

ওর বড় জা রান্নাঘরে ওকে বললে–রাঙা-বৌ, আমার ঘর থেকে গামছাখানা নিয়ে এসো না ভাই, গা ধুয়ে নিই কুয়োতলা থেকে। বড্ড গরম লাগচে বড়া ভেজে।

সুলেখা বললে–আলো আছে তোমার ঘরে?

–নেই। হারিকেনটা নিয়ে যাও ভাই।

বড় জার ঘরে ঢুকে গামছা খুঁজতে গিয়ে সুলেখার চোখে পড়লো একটা জিনিস।

ঘরের ছোট্ট টেবিলটার ওপর একখানা খাম পড়ে আছে, 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' ছাপ আছে তার ওপরে। খামটাতে নাম লেখা আছে, নীরজাসুন্দরী মিত্র, রায়গ্রাম, বাহিরগাছি পোষ্ট, জেলা নদীয়া। তাড়াতাড়ি সে খামখানা খুলে ফেলে পড়লে–সতেরোই আগস্ট তারিখে নীরজাসুন্দরী মিত্রের গান আছে রেডিওতে, তারই চিঠি ও কনট্রাক্ট ফরম্। উল্টে-পাল্টে দেখলে সুলেখা, কোনো ভুল নেই কোথাও। নির্ঘাত রেডিও-কনট্রাক্টের চিঠি।

কিন্তু কার নামে? নীরজাসুন্দরী মিত্র কে? একটা অস্পষ্ট সন্দেহ ওর মনে জাগলো। তাই যদি হয়? তখুনি সে রান্নাঘরে ছুটে এসে চিঠিখানা দেখিয়ে বললে–এ কার চিঠি, দিদি? নীরজাসুন্দরী কে?

BANGLADARSHAN.COM

ওর জা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে–দূর! ও আবার তুমি দেখতে গিয়েচো? আমারই নাম। নীরজা থেকে পাড়াগাঁয়ে সবাই বলে–নীরদা।

–কিন্তু মিত্র কেন? ঘোষ হবে তো?

–বিয়ের আগের নামটাই চলে আসচে রেডিও আপিসে। ওরা আর বদলায় নি। ও কিছু নয় ভাই–রেখে দে। ঠাকুরপোকে বারণ করে দিইছিলাম, নতুন বৌকে একথা বোলো না, আমার লজ্জা করে। তাছাড়া আমার দাদার বারণ ছিল, শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে এসব কথা জানালে কে কি বলবে। দাদা আমাকে গান শিখিয়েছিলেন কিনা? হিরণ্ময় মিত্র, নাম শুনেচ বোধ হয়?

বিখ্যাত গায়ক হিরণ্ময় মিত্রের ছোট বোন ও শিষ্যা সুগায়িকা নীরজাসুন্দরী মিত্র তার সামনে বসে তালের বড়া ভাজচে। সুলেখা শ্রদ্ধায় ও স্নেহে আঁচল দিয়ে বড়ো জার মুখ মুছে দিতে দিতে বললে–একদিন দিদি জয়জয়ন্তী ভাঁজছিলেন তাহলে আপনিই অনেক রাতে? ঘুমের ঘোরে শুনে সেদিন–পায়ের ধুলো দিন–তখন আমি ধারণাই করতে পারি নি। এতদিন বলা উচিত ছিল আমাকে। আমি কি করে জানবো?

॥সমাপ্ত॥